সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | মার্চ ২০২৪ | মূল্য ৫ টাকা

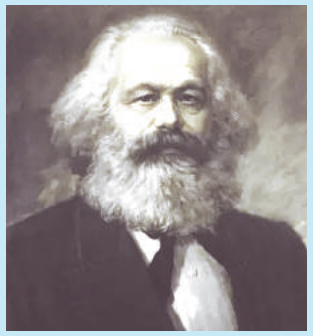

কার্ল মার্কস

প্রয়াণ দিবস: ১৪ মার্চ

“...বীরত্বপূর্ণ আত্মদানে প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণ ঘরবাড়ি ও স্মৃতিসৌধের উপর অগ্নিসংযোগ করেছে। শাসকশ্রেণি যখন সর্বহারাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করছে তখন সে আশা করতে পারে না যে তার বিশ্রামাগারের স্থাপত্য শিল্প হুবহু আগের মতোই থেকে যাবে। ভার্সেলাইসের সরকার চিৎকার করে বলছে,‘অগ্নিসংযোগ অগ্নিসংযোগ’।

... দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়ারা যুদ্ধের পর এই ধ্বংসকান্ড তৃপ্তির সঙ্গে দেখেছে।

যখন সরকার তার সেনাবাহিনীকে ‘হত্যা, পোড়ানো, ধ্বংস করার’ রাষ্ট্রীয় হুকুমনামা দিচ্ছে তা কি অগ্নিসংযোগের ফরমান নয়? যখন ব্রিটিশ বাহিনী রাজধানী ওয়াশিংটনের ওপর আগুন লাগিয়েছিল, আগুন লাগিয়েছিল চীন সম্রাটের প্রাসাদে, তা কি অগ্নিসংযোগ ছিল না? সামরিক প্রয়োজন ছাড়াই, শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রুশিয়ান বাহিনী যখন পেট্রোল দিয়ে অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল তখন তাকে অগ্নিসংযোগ ছাড়া কী বলা হবে?

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

কাজ নেই, খাবার নেই - দেশ নাকি বিশ্ব অর্থনীতির উদীয়মান টাইগার!

২০২৩ সালের শুরুতেই কানাডাভিত্তিক অনলাইন প্রকাশনা ‘ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট’ এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ততদিনে অর্থাৎ ২০২২ সালের মধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতির আকার ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই অর্থনীতিতে কোন দেশের হিস্যা কতটুকু সেটা দেখানোর জন্যই এই রিপোর্ট। এই রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এর আগেই আইএমএফ তাদের রিপোর্টে প্রকাশ করেছিল, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দুটি দেশ বিশ্বের ৫০টি বৃহৎ অর্থনীতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে– তার একটি বাংলাদেশ, অপরটি ভারত।

এই কথাগুলো সরকারের পক্ষ থেকেও বুক ফুলিয়ে বলা হয়। আমরাও শুনতে শুনতে জেরবার। কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তাকে মেলানো যায় না। আমরা বুঝতে পারি না, এতে আমাদের কী লাভ হলো? সরকারি হিসেবেই দেশে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১২ শতাংশের উপরে, যা গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে, দেশের ১২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কিনতে পারে না। মানসম্মত খাবার কিনতে না পারা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হিসেবে গোটা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ (অ্যাটলাস অব সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ২০২৩)।

তাহলে এই ৩৫ তম বৃহৎ অর্থনীতি দিয়ে আমরা কী করবো? প্রশ্ন উঠে, অর্থনীতির এই সিদ্ধান্তগুলো যে সকল সূচকের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো কি তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয়? কী দেখে এই অর্থনীতির বৃদ্ধিকে বিবেচনা করা হয়?

তবে কারও উন্নতি হয়নি, ব্যাপারটা এমন নয়। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে অল্পসংখ্যক মানুষ বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। বছরে অতিধনী বৃদ্ধির হারে আমরা গোটা বিশ্বকে পেছনে ফেলে দিয়েছি, কোটিপতি বাড়ছে হু হু করে। ফলে বাড়ছে ধনী-গরিব বৈষম্য। একটা দেশের ধনী-গরিব বৈষম্য কেমন সেটা বোঝা যায় গিনি সহগ দিয়ে। সত্তরের দশক এবং আশির দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির গিনি সহগ ছিল ০.৩৬। তখন অর্থনীতি ছিল ছোট। কিন্তু আয়বৈষম্য ছিল কম। এরপর অর্থনীতির আকার যতই বেড়েছে, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর যতো তালি আমরা পেয়েছি, আয়বৈষম্য ততই বেড়েছে। গিনি সহগ বাড়তে থাকা মানে আয়বৈষম্য বাড়ছে এবং এটি যখন ০.৫ অতিক্রম করে, তখন বুঝে নিতে হয় যে, আয়বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০২২ সালে বাংলাদেশের গিনি সহগ ০.৪৯৯। অর্থাৎ এটি একটি উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে পরিণত হয়েছে।

তার মানে, দেশের অর্থনীতি দু’ভাগ হয়ে আছে এবং এক ভাগের সম্পদ বৃদ্ধিকেই অর্থনীতির বৃদ্ধি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তারা সংখ্যায় ছোট, কিন্তু সম্পদ তাদের বেশি। আর যারা সংখ্যায় বেশি, সম্পদ তাদের খুবই অল্প। তা না হলে বছরে ২৭৬৫ ডলার অর্থাৎ মাসে ২৫ হাজার টাকার উপরে মাথাপিছু আয়ের মালিক এই দেশের শ্রমিকরা ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে রাস্তায় পড়ে গুলি খান কেন?

গার্মেন্টস খাত নির্ভর অর্থনীতি

রপ্তানী আয়ের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় অংশ এখানে কাজ করেন। এই রপ্তানীনির্ভর শিল্পটি কি আদৌ স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান? এর সাথে এই কথা যুক্ত যে, এই ধরনের রপ্তানীমুখী শিল্প দিয়ে একটা দেশের অর্থনীতি বড় (শুধু আকারের কথাই যদি ধরি) হলে তাকে কি আদৌ বড় বলা যায়?

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত, গার্মেন্টস শিল্প যাত্রা শুরু করে সত্তর দশকের শেষে। তবে আশির দশকেই এটি প্রসারিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

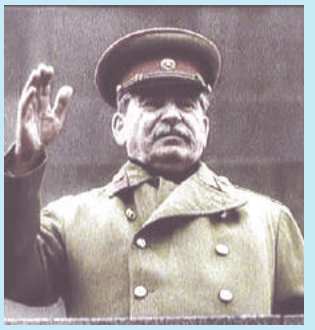

যোসেফ স্ট্যালিন

প্রয়াণ দিবস: ৫ মার্চ

“. . .সকলে সমান মজুরি পাবে, একই পরিমাণ মাংস ও রুটি পাবে, একই পরিমাণ কাপড় পরবে, একই পরিমাণে পণ্য পাবে– এরকম সমাজতন্ত্র মার্কসবাদের অজানা।

মার্কসবাদ বলে, যতদিন না শ্রেণিগুলি পুরোপুরি অবলুপ্ত হচ্ছে, যতদিন না জীবিকার উপায় থেকে শ্রমকে মানুষের মুখ্য চাহিদায় সামাজিক ঐচ্ছিক শ্রমে পরিণত করা যাচ্ছে, ততদিন মানুষ যে ধরণের যতটা কাজ করবে ততটাই মজুরি পাবে। ‘প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী’– এই হলো সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী সূত্র। অর্থাৎ সাম্যবাদের প্রথম স্তরের, সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরের সূত্র।

একমাত্র সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে, একমাত্র উচ্চতর স্তরেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে কর্মরত প্রত্যেককে তাদের কাজের বিনিময়ে তাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হবে। ‘প্রত্যেকের থেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী।’

এটা খুবই পরিষ্কার, জনগণের প্রয়োজনের পার্থক্য আছে এবং সমাজতন্ত্রেও এই পার্থক্য থাকবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষাধ্বংসকারী ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২১’: কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১। জাতীয় শিক্ষাক্রম নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কী বলা হচ্ছে?

– সরকারের ভাষ্যে, এটি শিক্ষার্থীদের পুরনো মুখস্ত নির্ভর মানুষ থেকে সৃজনশীল মানুষে পরিণত করবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলবে, প্রচলিত পরীক্ষানির্ভরতা থেকে মুক্তি দেবে, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া কমাবে, সকলকে একই ছাঁচে গড়ে না তুলে যার যেমন দক্ষতা ও উৎসাহ, তাকে সেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। বলা হচ্ছে, আমাদের দেশে নতুন আবিষ্কার হয় না, পেটেন্টে আমরা খুবই পিছিয়ে– এই শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক করবে। উচ্চশিক্ষিতদের চাকরির আশায় বসে থাকার বদলে উদ্যোক্তা হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করবে। এটা প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তা তৈরির শিক্ষাক্রম।

২। বারবার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা যাবে কি? শিক্ষাক্ষেত্রে অতীতের পরিবর্তনগুলো কি আদৌ ছাত্রস্বার্থে করা হয়েছিলো?

– আশির দশকে মাধ্যমিক স্তরে ল্যাবনির্ভর বিজ্ঞান বই চালু করা হয়েছিলো। তখন বলা হয়েছিলো বিজ্ঞান শিক্ষা ল্যাব এবং সরাসরি অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার্থীরা ল্যাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখবে এবং এভাবেই বিজ্ঞান হয়ে উঠবে আনন্দময়।

বাস্তব যা হলো– ঢাকা শহরসহ দেশের গুটিকয়েক

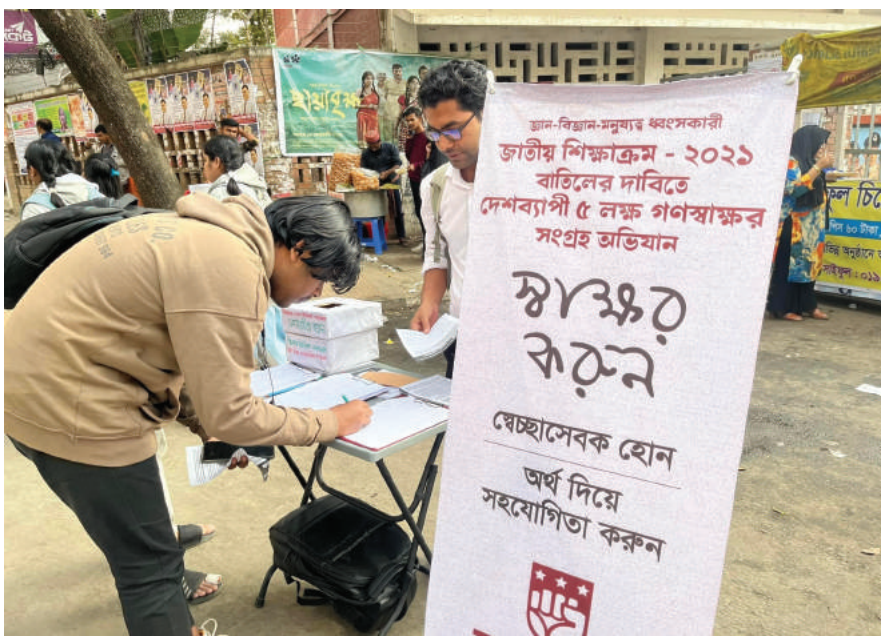

স্কুলের ল্যাব, ল্যাব উপকরণ এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকলেও দেশের অধিকাংশ স্কুলেই এসব ছিলো না। ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্বনির্ভর বই এবং অনুশীলন থেকে যতটুকু শেখার সুযোগ ছিলো এ পদ্ধতিতে তাও নষ্ট হলো। ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগ না নিয়ে অন্যান্য বিভাগ, বিশেষ করে বাণিজ্য বিভাগের দিকে ধাবিত হলো।

এরপর ১৯৯৬ সালে মুখস্ত নির্ভরতা কমানোর জন্য এমসিকিউ পদ্ধতি চালু করা হলো। বলা হলো, ‘রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর হয় ব্যাখামূলক। ফলে বড় বড় প্রশ্ন মুখস্ত করে শিক্ষার্থীরা পাশ করে। অনেকে মূল লেখাটিও পড়ে না, শুধু প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে। এমসিকিউ থাকলে তাকে বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে।’ তখন ৫০ শতাংশ রচনামূলক এবং ৫০ শতাংশ এমসিকিউ রাখা হলো।

বাস্তবে যা হলো– নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি হলো। সেখান থেকেই মুখস্ত করে পরীক্ষার্থীরা পাশ করতো। রচনামূলকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করার জন্য যতখানি পড়তে হতো, সেটাও কমে গেল।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

উদীয়মান টাইগার!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়ে আছে এই গার্মেন্টস খাতের উপর। এর আগে বাংলাদেশ কাঁচাপাট রপ্তানি করতো। এদেশে ভাল জাতের পাট উৎপাদিত হতো। পাট রপ্তানীতে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বে প্রথম। এদেশের আদমজী জুট মিল ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল। পাটজাত শিল্প উৎপাদনও হতো তখন। সত্তরের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের মূল রপ্তানী পণ্য ছিল পাট। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে পাটকলগুলো বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৩ সালে আদমজী পাটকল বন্ধ করা হয়, আর বাকিগুলোকে ধীরে ধীরে রুগ্ন করে ২০২০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সকল পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়।

ধীরে ধীরে আমাদের অর্থনীতি হয়ে পড়ে গার্মেন্টস নির্ভর। গার্মেন্টসের কাপড় তৈরির কাঁচামাল এবং বিক্রির বাজার– কোনটাই আমাদের হাতে নেই। দেশে গার্মেন্টসের পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর ইউরোপে। এসকল দেশের বাজারও অনেক বছর ধরেই কৃত্রিমভাবে চাঙা রাখা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে কেনাকাটা করা ও পরবর্তীতে সেটা শোধ করার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে সেখানে। এতে হাতে টাকা না থাকলেও লোকে পণ্য কিনতে পারে। ওইসকল দেশের মানুষের মনে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় যে ভোগবাদী সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে, সেটাই বাজারকে স্ফীত রাখে। ভোগ্যপণ্যই বাজারে অর্থ চলাচলের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, এইসকল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে বাজার অর্থনীতি টিকে থাকে।

কিন্তু এটা তো অস্থিতিশীল বাজার, যে কোনসময় এতে ধ্বস নামতে পারে। ২০০৮ সালে আমেরিকায় যখন মন্দা হলো, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তখন হুমকির মুখে পড়েছিল। সেসময় ধারাবাহিকভাবে ভর্তুকি দিয়ে গার্মেন্টস শিল্পকে রক্ষা করা হয়েছিল। আবার গার্মেন্টসই বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত টানা ৭ বছর ধরে প্রতিবছর ৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এই গার্মেন্টসে। অথচ পরবর্তী বছরগুলোতে দেখবো, রপ্তানী বাড়লেও কর্মসংস্থান কমেছে। ২০১১ থেকে ২০২০ এই ১০ বছরে এই খাত কর্মসংস্থান দিতে পেরেছে প্রতিবছর মাত্র ৬০ হাজার লোকের। আগের ৭ বছরের সাথে তুলনা করলে এটা খুবই কম। (বিশ্বব্যাংক ২০১৭)

অর্থাৎ গার্মেন্টসে কর্মসংস্থান কমছে। আবার অটোমেশনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিকই চাকরি হারাবেন বলে মনে করা হয়। তাহলে কাজ কোথায়? অর্থনীতি বড় হচ্ছে, অথচ কর্মসংস্থান হচ্ছে না। উৎপাদনমুখী কোন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না। বেশিরভাগ খাতই সেবামুখী। দেশের মোট শ্রমিকের প্রায় ৮৯ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। তারা আজ এখানে তো কাল ওখানে কাজ করেন। এই অর্থনীতির কি কোন ভিত্তি আছে?

সস্তা শ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা বিশ্বের বড় বড় ব্র্যান্ডগুলোকে ভারত ও চীন থেকে এদেশে নিয়ে এসেছিল, আরও সস্তা শ্রম নিয়ে এখন ইথিওপিয়া, মিয়ানমার ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো তাদের ডাকছে। তারা যেখানে সস্তা শ্রম পাবে, সেখানে যাবে। বৃহৎ অর্থনীতি, ইমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ তখন কী করবে?

মেগা প্রকল্পের অর্থনীতি

মেগা প্রকল্পগুলো ফ্যাসিবাদী সরকারের উন্নয়নের প্রোপাগান্ডার সর্বপ্রধান অস্ত্র। বড় বড় প্রকল্পগুলো দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্য নেয়া হয়নি, এগুলো মূলতঃ অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প। দেশে যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হয়, তাহলে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, কর্ণফুলি টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে কারা চলাচল করবে? যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো তৈরি করা হয়েছে তা জ্বালানী সক্ষমতা বাড়াবে না। কারণ কয়লা, গ্যাস ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বিরাট সক্ষমতা নিয়ে জ্বালানী সংকটে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কিংবা সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের ক্যাপাসিটি চার্জ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। ফলে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ বাড়ছে। তাই মেগা প্রকল্পগুলো দেশের মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে না, দেশকে শিল্পোন্নত করবে না। যদিও মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা পাল্টে যাবে, অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে– এসব কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে প্রকল্প চলাকালিন কিছুলোকের সাময়িক কর্মসংস্থান হয়, দীর্ঘস্থায়ী কর্মসংস্থান হয় না। সেটাও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, যেখানে লিখিত চুক্তির কোন বালাই নেই, যে কোন সময় যে কাউকে কাজ থেকে বাদ দেয়া যায়। কাজগুলোতে বিদেশি কোম্পানি যুক্ত থাকায় তাদের কাছ থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করতে হয়, অনেকসময় শ্রমিকদের একটা অংশও তাদের দেশ থেকে আসে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে শত শত ভারতীয় শ্রমিক যুক্ত ছিলেন, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চীনা শ্রমিকরা যুক্ত ছিলেন।

কর্মসংস্থানের এই গল্প দিয়ে ১০০টি স্পেশাল ইকনোমিক জোন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। অথচ এই মেগা প্রকল্পগুলো এবং বিশেষ অর্থনৈতিক জোন বাস্তবায়নে উচ্ছেদ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। রামপালে জমি দখল ঠেকাতে 'ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়েছিলো। রামপাল, মাতারবাড়ি, বাঁশখালীতে জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, কৃষি জমির কোন এককালিন ক্ষতিপূরণ হয় কি? সবচেয়ে বড় কথা, কর্মসংস্থান হলে মানুষ দলে দলে প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতো না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জানে, এই উন্নয়ন তাকে রাস্তায় বসাবে। এর ফলে বেকারত্ব বাড়ে, স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়– এককথায় গোটা স্থানীয় অর্থনীতিটাই পাল্টে যায়। কিছু রোজগার করে মোটামুটি চলতে পারা পরিবারগুলো শরণার্থীর মতো অবস্থায় পতিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ৭ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে– এতে শত শত পরিবার সব হারিয়ে বেড়িবাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছেন।

অর্থাৎ এই প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে না, বরং স্থানীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, স্থানীয় জনগণকে উচ্ছেদ করে এবং এক ধাক্কায় অনেক মানুষকে বেকার করে দেয়। এরাই পরবর্তীতে গার্মেন্টসের সস্তা শ্রমিকে পরিণত হন।

দানবিহীন দাতারা

তারা ঋণ দেন, দান করেন না–কিন্তু তারা দাতা, দাতাসংস্থা। এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে সরাসরি ঋণ নেয়া হয়, একে আবার বলা হয় 'দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা'। যে সহযোগিতার সুদ দিতে হয়, সেটা কী ধরণের সহযোগিতা, তা আমাদের মাথায় ঢুকে না। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি দেশের সরকারের পক্ষ থেকে করা হলেও বাস্তবে খোলাখুলি দুই পক্ষই তাদের দেশের বৃহৎপুঁজির স্বার্থরক্ষা করেন। এটা করার জন্য মানবাধিকার, গণতন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ– এইসকল আলোচনা তোলা হয়।

বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই, গত ৭ জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিভিন্ন তৎপরতাগুলো ভেবে দেখুন। ভারত এই অঞ্চলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আতঙ্কিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চিন্তিত মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিয়ে। আপাত অর্থে এই রাজনৈতিক শব্দগুলো শুনলে যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়, অথচ এর পেছনে আছে সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার– ব্যবসা। নির্বাচনের ৩ মাস আগে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশ সফরে আসলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। শেখ হাসিনা তাকে সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি দিলেন, সরকার ফ্রান্সের 'এয়ারবাস' কোম্পানি থেকে ১০টি উড়োজাহাজ ক্রয় করবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম প্রভাবশালী এই সদস্য নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আর কোন শক্তিশালী অবস্থান নেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে বছরব্যাপী চলা প্রবল গর্জন সমাপ্ত হলো বাংলাদেশে তাদের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের মার্কিন কোম্পানি 'বোয়িং' থেকে উড়োজাহাজ কেনার তদবিরের মাধ্যমে। নির্বাচনের একমাস পার হওয়ার আগেই তিনি শেখ হাসিনার সাথে দেখা করলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে এই প্রত্যাশা করলেন আর বোয়িং কেনার তদবির করলেন। বললেন, বাংলাদেশ বিমানের ক্রয় প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হয় এবং এখানে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসকে যুক্ত রাখা হয়।

আর ভারত তো সবই পাচ্ছে, এখানে কোন যদি-কিন্তু নেই। গত ১০ বছরে ভারত থেকে আমদানি ৩ গুণ বেড়েছে। ভারত যে ৬২টি দেশকে ঋণ দেয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণ নিচ্ছে বাংলাদেশ। প্রায় ৬২টি প্রকল্পে ৮০০ কোটি ডলারের ঋণ দেয়ার কথা, এর মধ্যে ১৪৯ কোটি ডলার ছাড় হয়েছে। এই সকল কাজে কেবলমাত্র ভারতীয় ঠিকাদাররাই অংশ নিতে পারেন, একতরফা দামেই কার্যাদেশ দিতে হয়। প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ (কিছু ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ৬৫ শতাংশ) সেবা ভারত থেকে কিনতে হয়। এগুলোর নাম হলো 'দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা'। এই সহযোগিতার উপর এখন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো দাঁড়িয়ে আছে। নিভু নিভু অর্থনীতির জ্বালানী হলো এই সহযোগিতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ১৯৬১ সালেই বলেছিলেন, "বিদেশি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠানো হলো মার্কিন রণনীতির এ অবিচ্ছেদ্য কৌশল যার সাহায্যে আমেরিকা সারা বিশ্বে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে।"

এটাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চেহারা, এই তার চরিত্র। ফলে দেশে গড়ে উঠা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও দেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত), এই দুইপক্ষকে সেবা দেয়ার সবচেয়ে যোগ্য বলেই আওয়ামীলীগ আজ ক্ষমতায়। আবার ভারতের বিরোধী শিবিরে থাকা চীনকেও তারা খুশি রাখতে পেরেছেন, পেয়েছেন রাশিয়ার আশীর্বাদ। যুক্তরাষ্ট্র চেঁচামেচি করে তার ভাগ হয়তো একটু বাড়ালেন, জাপান তো বহু আগে থেকেই সাথে আছেন। এই তো! এই হলো গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই!

পরিশেষে. . .

এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি কাজের সন্ধান দেবে কিনা, জীবনমান উন্নত করবে কিনা– এই প্রশ্নই অবান্তর। এটা সেই ব্যবস্থাই নয়। ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার মধ্য দিয়েই এ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে। এ ছাড়া এই নির্মম শোষণ, দুঃসহ অত্যাচার আর ঐতিহাসিক অন্যায় থেকে মানবসমাজের মুক্তির আর কোন পথ নেই।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশের রফতানিমুখী 'উন্নয়নের' ঝুঁকি, মধ্যবিত্তের বিকাশ ও স্থানীয় শিল্পায়ন– মাহা মির্জা

২. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য: সমাধান কোন পথে? – অধ্যাপক মইনুল ইসলাম

ভারতীয় আগ্রাসন

৩য় পৃষ্ঠার পর

মুক্তি দিতে পারেনি। পারেনি ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু, জাতভেদ মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের জন্ম দিতে। উল্টো অর্থনৈতিক জীবন থেকে উদ্ভূত অবমাননা এবং ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক ঘৃণায় রূপান্তরিত করেছে। আপোষকামী কংগ্রেসের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী জাতীয়তাবাদ, কার্যত মুসলিম ধর্মাবলম্বী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনাস্থা ও সন্দেহের ফলাফলে রাজনীতিতে মুসলিম লীগের আবির্ভাব ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় আসে দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত ও পাকিস্তান দুইদেশের শাসকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এই বিভেদকে উস্কে দিয়েছে, জিইয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মতো পুঁজিপতি শ্রেণির দল থাকায় সেটি এগোতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে আওয়ামী লীগই একে গলা টিপে ধরে, গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার দ্বার রুদ্ধ করে। এরপর দেশের শাসনক্ষমতায় যারাই এসেছে, নিজেদের ক্ষমতা সুরক্ষিত করতে সমাজে অগণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছে।

'আচ্ছে দিন'-এর স্লোগানকে সামনে এনে মুদি সরকার 'অখন্ড ভারত', 'হিন্দু ভারত' গড়ার কথা বলছে। ইতিহাসের অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। গোটা মুসলিম শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করছে। মুসলমান শাসকদের কপট, ঠগ এবং আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে। এই ভারত সরকারই আবার যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, তখন জনমনে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার না করে পারে না। এই ঘৃণাকে সঠিক দিশা দেয়ার মতো গণতান্ত্রিক চর্চা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর গণআন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সঠিক দিশা না পেয়ে এই ঘৃণা সুপ্ত জাতিগত অবমাননাবোধ, হীনমন্যতা এবং এ থেকে উদ্ভূত ক্ষোভকে উস্কে দেয়, যা দেশে একটি সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি করে। ভারতীয় আগ্রাসনকে ধর্মীয় আগ্রাসন হিসেবে চিহ্নিত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এতে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের শাসকদেরই লাভ, মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভেদ তৈরি করা তাদের জন্য সহজ হয়।

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন

শুধু বাংলাদেশ নয়, দুনিয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ নগ্নভাবে তার থাবা বিস্তার করছে। গোটা বিশ্বকে অগ্রাহ্য করে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল, আমেরিকা তাকে সমর্থন করছে। পশ্চিমের দেশগুলোতে মুসলিমবিরোধী মানসিকতা তৈরির চেষ্টা করছে এই হামলাকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য। এর বিপরীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামছেন ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। খোদ আমেরিকায় বিমান বাহিনীর একজন সদস্য ফিলিস্তিনিদের মুক্তির স্লোগান গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহুতি দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে বিভাজন সৃষ্টিকারী বক্তব্যকে বুঝতে হবে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ভারতীয় কর্পোরেটদের নেতৃত্বে চলা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বুঝতে হবে। ভারতে হিন্দুত্ববাদের জিগির তোলা হয়েছে সে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ভারতের জনগণ আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মিত্র। এই সত্য না বুঝে হিন্দুত্ববাদকে আলাদা করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, সেটা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালীই করবে।

সাম্যবাদ
১২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০২৪

ভারতীয় আগ্রাসনের স্বরূপ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর করা বিশ্বের বৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠির তালিকায় ভারতের ৫৫টি একচেটিয়া গোষ্ঠির নাম আছে, যেখানে জার্মানির সংখ্যা ৫২টি। শুধুমাত্র টাটা গ্রুপই ৬টি মহাদেশের একশটিরও বেশি দেশে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে। ভারতীয় কোম্পানি 'আর্সেলর মিত্তাল' পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 'স্টিল' উৎপাদক। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি 'ট্রাক্টর' বিক্রি করে 'মাহিন্দ্রা'। আফ্রিকাতে ভূমি দখলের শীর্ষে রয়েছে ভারতীয় কর্পোরেশনগুলো। অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা ট্রাস্ট, কার্টেল, সিন্ডিকেটের জন্ম দিয়ে গোটা পৃথিবীতেই তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করছে। শুধুমাত্র ২০২০ সালেই ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২০০৮ সালেই ভারত ১২২ টির অধিক দেশে পুঁজি লগ্নি করতো। শুধু পুঁজি বিনিয়োগ নয়; নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, কেনিয়া, জাম্বিয়ার মতো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও তারা নানান মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বাড়ানোর চেষ্টায় ভারত দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছে।

এ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ভারত শুধু সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রই অর্জন করেনি, উপরন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে তার আক্রমণের থাবা প্রসারিত করেছে।

ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশ

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যেখান থেকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলের দেশসমূহে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ফলে বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। 'ইন্দো-প্যাসিফিক' (ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে যে দেশগুলো রয়েছে) অঞ্চলে প্রায় তিনশ কোটি মানুষের বাজার। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ চায় আমেরিকা, চীন, ভারতের মতো শক্তিগুলো। বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে ভারত-আমেরিকা-চীনের ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের অর্ন্তনিহিত কারণ এই ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে ভারত ও চীন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। আবার দীর্ঘদিন থেকে ভারত ও আমেরিকা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। এ সত্ত্বেও ভারত এবং চীন উভয়েই এক মেরু বিশ্ব থেকে বহু মেরু বিশ্বের দিকে যেতে চায়, এ জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্যের প্রশ্নে ভারত আমেরিকার মুখোমুখিও দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে আমেরিকা, চীন ও ভারতের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, আমেরিকা-ভারত বিরোধের মধ্যে দিয়েই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে চীন বা আমেরিকার চেয়েও ভারতীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা তীব্র ও প্রকট। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেইন মুহম্মদ এরশাদকে একতরফা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। পরবর্তীতে এরশাদ প্রেসের সামনে সেটি প্রকাশ করেন। ২০২৩ সালে ভারতের ভূমিকা আরও দৃঢ়, অথচ আওয়ামী লীগ ততদিনে জনগণ কর্তৃক পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি ভারতের কাছে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সংহতির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের তিন দিকই ভারতীয় সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা ভারতের বুকের ভেতর। ভারত মনে করে বাংলাদেশে অন্য কোন শক্তির অবস্থান তাদের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। আবার ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' খ্যাত ৭টি রাজ্যের সাথে সংযোগ ও সংহতি ধরে রাখতে হলেও এ নিয়ন্ত্রণ তাদের চাই। 'চিকেন নেক করিডোর' দিয়ে 'সেভেন-সিস্টার্সে' যাতায়াত, নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহার করতে পারলে তাদের সময় ও খরচ দুটোই বাঁচে। সাত বোন খ্যাত রাজ্যগুলোতেও কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। তাই যেকোন মূল্যে বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম ভারতের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন: বিপন্ন হবে দেশের স্বার্বভৌমত্ব

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলকে ঘিরে ইতোমধ্যেই একটি জটিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সমীকরণ গড়ে উঠেছে। আপাত অর্থে মনে হতে পারে আমেরিকা, চীন এবং ভারতের মধ্যে এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু না, এই দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার মতো স্বাধীন ও স্বনির্ভর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর নেই। উল্টো আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতার স্বার্থে বাংলাদেশকে ক্রমেই এ সংঘাতে জড়িয়ে ফেলছে। এ সময় আওয়ামী লীগ আমেরিকার বিরাগভাজন হলেও সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ চীনের। বাংলাদেশে যে ১০০টি 'ইকোনোমিক জোন' ও ২৭টি 'হাইটেক পার্ক' নির্মাণ হচ্ছে সেখানে চীনের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ আছে। আবার চীন বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জামের প্রধানতম যোগানদাতা। এ স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছে ভারত। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থির করছে তা নয়, বরং সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে বিপন্ন করে তুলছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, ভূ-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই ভারত তার নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অথচ বাংলাদেশের জন্য স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যেই ট্রানজিটের নামে ভারত করিডোর সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। পণ্য পরিবহনের নামে পাওয়া করিডোর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতে রাজনৈতিক সংকট ও বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশের ভূখন্ড ব্যবহার করতে পারে– এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বাংলাদেশ সরকার ভারতকে স্থলপথ ও রেলপথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, আবার মংলা ও চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতিও পেয়েছে ভারত। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে 'কোস্টাল সার্ভিল্যান্স' বা উপকূলীয় নজরদারির জন্য ভারত স্যাটেলাইট চালু করেছে, যা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ সকল ক্ষেত্রে ভারতের অবাধ সুবিধা বাংলাদেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্দ্বন্দ্ব যত তীব্র হবে, ভারত-চীন দ্বন্দ্বও তত প্রকট হবে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভারতের জন্য ভূ-সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে। আবার একইভাবে চীনও তার অর্থনৈতিক প্রভাব খাটাবে। ফলে বাংলাদেশের মানুষ যুক্ত হয়ে পড়বে একটি অযাচিত সংকটে।

বাড়বে অর্থনৈতিক সংকট

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ডলার সংকটে আছে। ডলার সংকটের কারণে ব্যবসায়ীরা এলসি খুলতে পারছেন না। ডলারের বিপরীতে টাকার মান গত এক বছরে কমেছে প্রায় ৩৫টাকা। এদিকে এ বছর থেকেই শোধ করতে হবে মেগা প্রকল্পগুলোতে নেয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ। কিন্তু বাংলাদেশের হাতে ডলার নেই। এই ঋণ পরিশোধের জন্যও তাকে ঋণ করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ভারতের সাথে টাকা ও রুপিতে লেনদেন শুরু করেছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৬০০ কোটি ডলারের। এর মধ্যে ভারত ১৪০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করে মাত্র ২০০ কোটি ডলারের পণ্য। অর্থাৎ প্রতি বছর বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ১২০০ কোটি ডলারের। আর এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশ যে পণ্য ভারতে রপ্তানি করে সেটি রুপিতে বিনিময় শুরু হয়েছে। ভারতকে পরিশোধ করতে হচ্ছে ডলারে। এই রুপি-টাকায় একবার লেনদেন শুরু হলে তা বিভিন্ন সেবামূলক বাণিজ্যে ছড়িয়ে পড়বে, যা বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে পারে।

বাস্তবে রুপিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় রূপান্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী অভিলিপ্সা। এখনও গোটা বিশ্বে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলারই প্রধান বিনিময় মাধ্যম। তবে ইতোমধ্যেই 'ডি-ডলারাইজেশন' শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই ২২টি দেশ রুপিতে লেনদেন শুরু করেছে। রুপিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় রূপান্তরের চেষ্টা মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থান শক্ত করার একটি প্রক্রিয়া। ফলে টাকা ও রুপিতে লেনদেন করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটবে না, তারা নির্ভরশীল হবে আর ভারতীয় মুদ্রা শক্তিশালী হবে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য জ্বালানিখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জ্বালানীর ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভর নীতি নিয়ে চলছে। ফলে গোটা এনার্জি সেক্টরকে সে ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে। ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন, পেট্রোনেট এলএনজিসহ ভারতীয় কোম্পানিগুলি জ্বালানি খাতকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ভারতের শক্তিশালী কর্পোরেট আদানির কাছ থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি হয়েছে। এতে শিল্প উৎপাদনের জন্য আবশ্যক জ্বালানিখাতকে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে ভারতের প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলা হলো। অথচ উচিত ছিল এরকম একটি আগ্রাসী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর যতটা সম্ভব কম নির্ভরশীল হওয়া।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাংলাদেশে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রবল। বাংলাদেশে বিদেশী টিভি চ্যানেলের শতকরা ৯০ শতাংশই হলো ভারতীয়। বাংলাদেশে ভারতের এত বিশাল সংখ্যক টিভি চ্যানেল দেখানোর অনুমতি থাকলেও ভারতে বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল দেখানোর অনুমতি নেই। ব্লিৎসের এক জরিপে দেখা যায়, প্রতি মাসে ভারতীয় চ্যানেল স্টার প্লাস ১৯৫ হাজার ডলার, স্টার মুভিজ ১১৮ হাজার ডলার, সনি ১২৩ হাজার ডলার, স্টার গ্লোল্ড ৬১ হাজার ডলার, জি সিনেমা ৯৫ হাজার ডলার আয় করে। এ তালিকা আরো দীর্ঘ করা যাবে। শুধু আর্থিকভাবে নয়; এসব চ্যানেলের অনুষ্ঠান ও বিষয়বস্তু সমাজ মননে গভীর প্রভাব ফেলছে। ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে। 'মটু-পাতলু', 'শিবা', 'ছোটা ভিম' ইত্যাদি কার্টুন চরিত্রগুলির প্রভাবে এক ধরণের কাল্পনিক 'হিরো' বা 'সংকটমোচন' চরিত্র হিসাবে তারা নিজেদের ভাবতে থাকে। টিভি সিরিয়ালে দেখানো বিলাসী জীবন, সন্দেহ, পারিবারিক কলহ পরিবারগুলোতে স্বাভাবিক সম্পর্কে ফাটল ধরাচ্ছে। অথচ নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত মানসম্মত নাটক তৈরি হতো বাংলাদেশে। একে ধ্বংস করে দিতে না পারলে ভারতীয় নাটকের বাজার প্রসারিত হবে না। একে অনেকে 'সফ্‌ট পাওয়ার' বলেন। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন - অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধ্বংস করছে নদী-প্রাণ-প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ভারত একতরফাভাবে নদীশাসন করছে। ফারাক্কার ভয়াবহ প্রভাবের কথা আমরা জানি। তিস্তা বা ফেনী নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশের মানুষ এখনও পাননি। বরাক নদী উজানে টিপাই বাঁধ সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনার প্রবাহকে শুকিয়ে দিচ্ছে। ভারত থেকে প্রায় ৫৪টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ সকল নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট করে ভারত বাংলাদেশের সমূহ ক্ষতি করছে। পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদীতে সাগর থেকে নোনা পানি প্রবেশ করছে। স্বাভাবিকভাবেই নোনা পানিতে স্বাদু পানির মাছ, জলজ উদ্ভিদ কিছুই বাঁচতে পারে না। ফলে কমছে কৃষিজমির উর্বরতা। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র গোটা সুন্দরবনকেই বিপন্ন করছে। আর এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ভারত।

বন্ধুত্বের উপহার– ফেলানির ক্ষত-বিক্ষত লাশ!

ভারত বন্ধুত্বের কথা বলে, অথচ সীমান্তে বিএসএফের দ্বারা বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার মিছিল থামছে না। ২০১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সীমান্ত সম্মেলনে সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত। সে প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাবমতে, ২০১৫ থেকে ২০২৩– এই নয় বছরে বিএসএফের হাতে ২৪৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার শিকার হয়েছেন। এর কোন একটিরও বিচার হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ জনগণের বন্ধু নয়, রক্তখেকো জানোয়ার।

সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষার প্রয়োজনেই হিন্দুত্ববাদ এসেছে

অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের উপর ভারতের আগ্রাসনের কারণ বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি। বাংলাদেশ একটি মুসলমান রাষ্ট্র– এ কারণে ভারত বাংলাদেশের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াচ্ছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ভারতের মুসলিম ধর্মাবলম্বী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেও একটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক জিগিরে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আওয়ামী লীগও এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করে তার রাজনৈতিক ফায়দা তুলে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের উপর ভারতীয় শাসকদের আগ্রাসনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করলে এর মূল দিকটি আড়াল হয়ে যায়। আক্রমণের গভীরতা সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় না। এতে মনে হতে পারে, ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বিজেপি অপসারিত হয়ে তথাকথিত কোন গণতান্ত্রিক শক্তি (!) ক্ষমতায় আসীন হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন। ভারতের এ আগ্রাসন যদি শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদী অর্থাৎ মুসলিমবিরোধী চরিত্রের হয়ে থাকে, তাহলে নেপাল বা শ্রীলংকায় ভারতীয় আগ্রাসন থাকার কথা নয়। অথচ বিশ্বের দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের একটি ভারত, অন্যটি নেপাল হওয়ার পরও নেপালের জনগণের মধ্যে প্রবল মাত্রায় ভারতবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান। এই মনোভাব ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কারণে। শুধু নেপাল নয়; শ্রীলংকা, কেনিয়া, মালদ্বীপ, মালেশিয়ায়ও ভারত আগ্রাসন চালাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মতো নেপাল, শ্রীলংকার মানুষও বিক্ষুব্ধ। ভারতীয় আগ্রাসনের কারণ শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ হলে, ভারত সৌদি আরব, আরব আমিরাতের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতো না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও ভারতের সাথে সম্পর্ক রাখতো না। ভারত শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালাচ্ছে। আফ্রিকার তামা সমৃদ্ধ জাম্বিয়াকে লুট করে নিচ্ছে। শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদ বা ধর্মীয় বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ভারত এ তান্ডব চালাচ্ছে– এ অত্যন্ত খোঁড়া যুক্তি, যা মূল সমস্যার সঠিক উত্তর দিতে অপারগ।

ভারত ও বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ অতি পুরাতন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ কালপর্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জাতিগত বোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। অতীতে এ অঞ্চলে (বাংলাদেশ) মূলত কৃষিজীবী মানুষেরা বসবাস করতেন। তাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিলো জমিদার-জোতদারদের দ্বারা। এই জমিদাররা মূলতঃ ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং থাকতেন কলকাতায়। সাধারণ কৃষকরা ছিলেন তাদের রায়ত বা প্রজা। জমিদাররা শুধু অত্যাচার-জুলুম নয়, প্রজাদের মধ্যে হীনমন্যতা-অবমাননার মধ্যে রাখতেন। ফলে প্রজাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জমিদারদের অত্যাচারে ক্ষোভ তৈরি হয়। যার সাথে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে ছিল সামাজিক অবমাননা থেকে মুক্তির আকুতি। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন জনগণের মনকে এই ক্ষোভ ও অবমাননা থেকে

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গাইবান্ধায় বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কমিটি গঠন

গত ২৭ জানুয়ারি কৃষক সমাবেশের মাধ্যমে গিদারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কমরেড গোলাম সাদেক লেবুকে সভাপতি ও কমরেড মাহবুবর রহমান খোকাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট সদর উপজেলা কমিটিকে পরিচিয় করিয়ে দেওয়া হয়।

জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রবিবার, বেলা ১১টায় ঢাকার তোপখানা রোডস্থ বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে 'শ্রমিক হত্যা, জবরদস্তিমূলক শ্রম পরিস্থিতি, নিবর্তনমূলক আইন ও ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত শ্রমিক: গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা মনজুরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রারম্ভিক লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম। জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শামীম ইমামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি চৌধুরী আশিকুল আলম, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, শ্রমিক নেতা উজ্জ্বল রায়, হারুনার রশিদ ভূঁইয়া, এএএম ফয়েজ, সাদেকুর রহমান শামীম, মীর মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, সুশান্ত সিনহা, মোজাফফর হোসেন, আব্দুল কুদ্দুস, মোহাম্মদ গোফরান, আব্দুল হাশিম কবির প্রমুখ। এ ছাড়া মতবিনিময় সভায় চা-বাগান, পাটকল, পরিবহন, চাতাল ও রাইস মিল, পাদুকা শিল্প, গার্মেন্ট, টেক্সটাইল-সহ বিভিন্ন শিল্পখাতের শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এ মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, দেশে ক্রমাগত শ্রমিক অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যায্য মজুরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে কায়েমী স্বার্থের অনুগত দালালির বিপরীতে শ্রমিক আন্দোলনকে সংগ্রামী ধারায় পরিচালিত করতে হবে। মত-বিনিময় সভায় বক্তারা আন্দোলনমুখী ও আদর্শিক ধারার ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর বিক্ষোভ

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পুরনো পল্টন মোড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবিতে এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বাসদ (মার্কসবাদী)-এর বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য রাজু আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্টির ঢাকা নগরের সমন্বয়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য সীমা দত্ত। একইদিনে চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ হয়।

শ্রমিক হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আশুলিয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, মজুরির দাবিতে আন্দোলনকারী ৪ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যার বিচার, আহত ও নিহত শ্রমিক পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, শ্রমিক নির্যাতন-হয়রানি-ছাটাই বন্ধ, শ্রমিকদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সকল শ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে আশুলিয়ার বাইপাইলে এক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে এবং শ্রমিক নেতা শাহজালালের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সংগ্রামী সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, শ্রমিক নেতা নয়া মিয়া টুলু প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাইপাইলের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বর্ধিত মূল্য বাতিলের দাবিতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে বাম জোটের বিক্ষোভ

গত ১১ মার্চ ২০২৪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং ধাপে ধাপে মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা বাতিলের দাবিতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। এসময় জোটের নেতাকর্মীদের অনেকে আহত হয়। পরবর্তীতে পল্টন মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিবির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

বাসদ (মার্কসবাদী) দলের আন্দোলনের কারণে টাকা ফেরত পেলেন সন্ধানী লাইফ ইনসুরেন্সের গ্রাহকরা

সন্ধানী লাইফ ইনসুরেন্স জীবনবীমার মাঠকর্মী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত পাওনা টাকা ফেরতের দাবিতে ভুক্তভোগী গ্রাহকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা।

আন্দোলনের একপর্যায়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে টাকা আত্মসাৎকারীরা হামলা চালায়। এতে বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক আলাল মিয়া ও সদস্য সোহরাব উদ্দিনসহ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

হামালার পর তাৎক্ষণিকভাবে গোবিন্দপুর বাজার, হোসেনপুর উপজেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে বিক্ষোভ হয়। পরদিন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের নেতৃত্বে রাজধানী ঢাকায় ও বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে হামলাকারীদের বিচার ও গ্রাহকদের সমুদয় টাকা ফেরত দেয়ার দাবি জানানো হয়।

এই ঘটনায় হামলাকারীরা ভীত হয়ে স্থানীয় কিছু অসাধু লোকজনের মারফত একটি সালিশের আয়োজন করে। গ্রাহকদের বীমার টাকা ফেরত ও বাসদ (মার্কসবাদী) নেতাদের উপর হামলার বিচারের শর্তে জেলা সমন্বয়ক কমরেড আলাল মিয়াসহ দলের নেতারা সালিশে অংশ নেন। এতে ভুক্তভোগী বীমার গ্রাহকরাও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সালিশে যাওয়ার পর ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালীরা বাসদ (মার্কসবাদী) নেতৃবৃন্দকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এবং গ্রাহকদের টাকার ব্যাপারে কথা না বলে উল্টো বীমা কর্মীর পক্ষ নেয়। বিচার না পেয়ে গ্রাহকরা সেখান থেকে চলে আসে।

এরপর বাসদ (মার্কসবাদী) গ্রাহকদের আবারও সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলে। গ্রাহকদের হাতে থাকা কিছু বই সংগ্রহ করে নেতৃবৃন্দ ঢাকায় সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্সের কেন্দ্রীয় অফিসে যোগাযোগ করেন ও বই জমা দেন। মাঠপর্যায়ে চলতে থাকা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১৩ জন বীমার গ্রাহক তাদের চেক বুঝে নেন। বাসদ (মার্কসবাদী) গোবিন্দপুর বাজার কার্যালয়ের সামনে এই চেক বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আলাল মিয়ার সভাপতিত্বে ও নাগরিক কমিটির খায়রুল ইসলাম ফকিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক জনাব মোস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান আকন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান তোতা, বীরমুক্তিযোদ্ধা নাজমুল আলম, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট এম এনামুল হক, বিশিষ্ট সমাজসেবক দিদারুল আলম ভূইয়া নাদিম, রঞ্জিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক আবুল হাসেম আকন্দ, বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলার সদস্য জমির উদ্দিন, সোহরাব উদ্দিন, এবায়দুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আন্দোলনের এই বিজয় গ্রাহকদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যাদের বই ও রিসিট নাই, তাদের মামলা চলমান আছে। আমরা আশা উক্ত মামলাতেও গ্রাহকরা জয়ী হবেন।

কার্ল মার্কস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যখন থিয়ের ছয় সপ্তাহ ধরে প্যারিসের উপর বোমা বর্ষণ করেছিল তা কি অগ্নিসংযোগ ছিল না? সমস্ত যুদ্ধেই আগুন প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ...কিন্তু দুনিয়ার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কমিউন আত্মরক্ষার্থেই একমাত্র আগুনকে ব্যবহার করেছে। তারা ভার্সেলাইসের সেনাবাহিনীকে থামানোর জন্যই আগুন ব্যবহার করেছে...তাদের পশ্চাদপসরণকে গোপন করার জন্যই আগুনকে ব্যবহার করেছে। কমিউন ভাল করেই জানে প্যারিসের জনগণের জীবনের প্রতি শত্রুপক্ষের কোনো মায়া নেই।. . .

যদি প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণের কাজকে নির্মমতা বলা হয়, তাহলে সেই নির্মমতা এসেছে প্রতিরোধের মরিয়া প্রচেষ্টা থেকে। এই নির্মমতা বিজয়ীর নির্মমতা নয়।. . .প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণের নির্মমতা ন্যায়সঙ্গত– কারণ এই নির্মমতার জন্ম হয়েছে একটা নবোত্থিত সমাজ ও আর একটা পুরানো ভেঙ্গে পড়া সমাজের সুবিপুল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।. . .

'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ'

যোসেফ স্ট্যালিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য যে আছে, একথা সমাজতন্ত্র কখনও অস্বীকার করেনি। সবাইকে সমান করার দিকে স্টারনারের ঝোঁকের জন্য মার্কস কিভাবে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, সেটা দেখুন; ১৮৭৫ সালে গোথা কর্মসূচীর উপর মার্কসের সমালোচনা এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের পরবর্তী লেখাগুলি অধ্যয়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন কি তীক্ষ্ণভাবে তাঁরা এই ধারণার উপর আঘাত হেনেছেন। এই ধারণার উৎস হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষকসুলভ মানসিকতা, ভাগ করার ও সমান ভাগের মনোবৃত্তি। আদিম কৃষি সাম্যবাদের মনোভাবের সাথে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। যারা মার্কসবাদের সাথে অপরিচিত, একমাত্র তারাই এই আদিম ধারণা পোষণ করতে পারে যে, রুশ বলশেভিকরা সমস্ত সম্পদকে এক সাধারণ তহবিলে জড়ো করতে চায় ও তারপর তা সমানভাগে ভাগ করতে চায়। এই ধারণা, মার্কসবাদের সাথে সম্পর্কহীন মানুষের ধারণা। ক্রমওয়েল আর ফরাসী বিপ্লবের সময়কার 'আদিম কম্যুনিস্টরা' এইভাবেই সাম্যবাদকে বুঝেছিলেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীদের সাথে মার্কসবাদ ও রুশ বলশেভিকদের কোন সম্পর্ক নেই।"

জার্মান লেখক এমিল লুডভিগের সাথে সাক্ষাৎকারে

ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে রংপুরে মিছিল ও ডিসি অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বুধবার সকাল ১১টায় খাস জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ এবং সর্বজনীন রেশন চালুর দাবিতে রংপুর মহানগরীতে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন, রংপুর' এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। উক্ত অবস্থান কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্য হবিবর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রধান সংগঠক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সংগঠক আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা এবং গৃহকর্মী প্রীতি উরাং হত্যার বিচারের দাবিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

ছবি: গাইবান্ধা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ৮ মার্চ বিকাল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী আন্দোলনকে বেগবান করার আহ্বান জানিয়ে এবং গৃহকর্মী প্রীতি উরাং হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত এবং পরিচালনা করেন দপ্তর সম্পাদক তৌফিকা লিজা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি ও গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি আসমা আক্তার, সদস্য সুস্মিতা রায়। নারী দিবস নিয়ে রচিত গান পরিবেশন করেন সুস্মিতা রায় সুপ্তি ও আইরিন আকতার।

জার্মানির MLPD পার্টির সাথে বাসদ (মার্কসবাদী) এর মতবিনিময়

গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে Marxist Leninist Party of Germany (MLPD) এর চেয়ারপার্সন গ্যাবি ফেচনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল 'বাসদ (মার্কসবাদী)' দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। দলের পক্ষ থেকে সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা গ্যাবি ফেচনারের হাতে দলের পতাকা ও স্মারক তুলে দেন। মতবিনিময় সভায় বাসদ (মার্কসবাদী) দলের প্রতিনিধি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য, শফিউদ্দিন কবির আবিদ ও ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০০৯ সালে পিইসি এবং জেএসসি চালু করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, 'এ পরীক্ষা দুটি দশম শ্রেণির পর যে এসএসসি পরীক্ষায় বসতে হয় তাতে ভয় কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কম বয়সে দুটি সার্টিফিকেট পেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং পড়াশোনার প্রতি তারা আগ্রহী হবে।'

বাস্তবে যা হলো– ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে দ্রুত 'MDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য গণহারে পাশ করিয়ে দেয়া শুরু হলো। খাতায় কিছু লিখলেই নম্বর দেয়া, শিক্ষকের সহযোগিতায় পরীক্ষার হলে উত্তর লিখে দেয়া এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ড ঘটতে থাকলো। এ দুটি পরীক্ষার কারণে গাইড এবং কোচিং নির্ভরতা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেলো।

এরপর ২০১২ সালে মুখস্তের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করে নিয়ে আসা হলো 'সৃজনশীল পদ্ধতি'। তখন বলা হয়েছিল, 'এই পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও কাজ– এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শুধু মুখস্ত করে বা সিলেবাস পড়ে ভালো ফলাফলের দিন শেষ। কোচিং এবং গাইড ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।'

বাস্তবে যা ঘটলো– শিক্ষক সংকট, মানসম্মত শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণের অভাব, নিম্ন আর্থিক বরাদ্দ এবং দুর্বল অবকাঠামোর কারণে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই বিপদে পড়লেন। কী করে পড়াতে এবং প্রশ্ন করতে হয় সে সম্পর্কে ভালো ধারণার অভাবে শিক্ষকরা গাইড দেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে লাগলেন। সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও এসবের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলো। কোচিং ও গাইড ব্যবসা আরও বৃদ্ধি পেলো। প্রশ্নফাঁস এবং নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার ফলে প্রায় শতভাগ পাশ নিশ্চিত হলো। শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকলো।

এই সকল ঘটনা থেকে কোন শিক্ষা না নিয়ে ঝরে পড়ার জন্য, না বুঝে মুখস্ত করার জন্য, শিক্ষার নিম্ন মানের জন্য শিক্ষাক্রমকে দায়ী করে আবার শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পূর্বের পরিবর্তনগুলোর ব্যর্থতার কারণ নিয়ে কোন গবেষণা চালানো হয়নি। এগুলোর কোন রিপোর্টও প্রকাশিত হয়নি। প্রচলিত পাঠদান ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষার নিম্ন মান নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে যুক্ত করে কোন পর্যালোচনা হয়নি। একতরফাভাবে শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করে রাতারাতি প্রায় সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর আগে ২০১০ সালে প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'–এ ঘোষিত অনেক প্রস্তাবনা ও পদ্ধতি খারিজ করা হয়েছে, কিন্তু কোন পর্যালোচনা রাখা হয়নি। শিক্ষার বিদ্যমান সমস্যাগুলোও চিহ্নিত করা হয়নি।

৩। অতীতের পর্যালোচনা না করলেও, শিক্ষাক্রম প্রণেতারা কি খসড়া শিক্ষাক্রমের উপরে ব্যাপক মতামত নিয়েছেন? শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের তাদের মনোভাব কি গণতান্ত্রিক?

– সাধারণ মানুষ নতুন এই শিক্ষাক্রম তৈরির বিষয়টি জানতেই পারেনি, মতামত দেয়া তো দূরের কথা। শিক্ষাক্রমটির খসড়া-বক্তব্য নামকাওয়াস্তে ওয়েব সাইটে উন্মুক্ত রাখা হয় এবং এর ওপর মতামত দেয়ার জন্য মাত্র দুই সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে জনগণকে জানানো এবং মতামত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণা একেবারেই করা হয়নি। মেট্রোরেলের একটি স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের একটা অংশ কিংবা বিমানবন্দরের অসমাপ্ত ৩য় টার্মিনাল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়ে উদ্বোধন করা হয়– অথচ জাতীয় শিক্ষাক্রমের মত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জনগণকে অজ্ঞাতে রেখে বাস্তবায়নের কারণ আমাদের বোধগম্য হয়নি।

যে প্রতিষ্ঠান এটি প্রণয়ন করেছে সেটিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্রিয়া করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ড. ছিদ্দিকুর রহমান শুরুতে এই শিক্ষাক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

এই শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে যারা সমালোচনা করেছেন ও বক্তব্য রেখেছেন, তাদেরকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে নানা জায়গায় বদলি করা হয়েছে। গত দুই বছরে ৫০ জনেরও বেশি কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এরমধ্যে গত ৬ মাসে বদলি করা হয়েছে কমপক্ষে ৩৫ জনকে। মতবিরোধের কারণে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষা উইংয়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসানকে ওএসডি করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার অগণতান্ত্রিক আচরণ করেছে শুধু তাই নয়, এটি বাস্তবায়নেও সরকার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও আগ্রাসী। এই শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কোন ধরনের সমালোচনা, পরামর্শ ও ভিন্ন বক্তব্যকে সরকার রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড বলে আখ্যায়িত করছে। এমনকি যারা এই শিক্ষাক্রমের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করছেন, সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখি করছেন কিংবা আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন– সরকার তাদের কোচিং, গাইড ব্যবসায়ী বলে তকমা দেয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবিতে সারাদেশে 'সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন' নামে আন্দোলনের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠে। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ৪ জন শিক্ষক-অভিভাবককে সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায় এবং ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঘোষিত ৫ লক্ষ গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচীতে বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা মারধর এবং বাধা প্রদান করে। 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' এই বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নিলে শেষ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিলনায়তনের বরাদ্দ বাতিল করে দেয়।

নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বলে দেয়া হয়েছে, এই শিক্ষাক্রমের সাথে বিরোধাত্মক হয়, এমন কোন মতামত দেয়া যাবে না। ঢাকা শহরের একটি খ্যাতনামা স্কুলের শিক্ষক বলেছেন, 'অধিকাংশ শিক্ষকই এই শিক্ষাক্রমের পক্ষে নয়, কিন্তু তাদের হাত-পা বাঁধা। চাকরি রক্ষার জন্যই তারা এসব করছেন।' স্কুলগুলোর অভিভাবক বৈঠকে শিক্ষকদের দিয়ে বলানো হচ্ছে, কোন অভিভাবক যদি এই শিক্ষাক্রমের বিরুদ্ধে কথা বলেন তবে আপনার সন্তানের ক্ষতি হবে। এরইমধ্যে দুইজন শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কিছু ভুলভ্রান্তি, অসংগতি এবং শিক্ষাক্রম নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখি করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।

৪। বর্তমান অবকাঠামোর মধ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করা যাবে কি?

– নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করা হয়েছে বলা হচ্ছে। তা হলো– ধারাবাহিক মূল্যায়ন (continuous assessment)। যদিও ধারাবাহিক মূল্যায়ন একেবারে নতুন নয়, ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমেও ধারাবাহিক মূল্যায়নের উল্লেখ ছিল। কিন্তু এবারে এর উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একেই প্রধান করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন মানে পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দেয়া নয়। বরং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করার চেয়ে, সারাবছর বিভিন্ন ধরনের ক্লাস টেস্ট এর মধ্য দিয়ে মেধা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া অনেক স্কুলই অনুসরণ করে।

কিন্তু এটা সে ব্যাপার নয়। এখানে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে প্রতিদিন। একটি ক্লাসে ৩৫-৪০ মিনিট সময়ে কোন নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানো, বোঝানো, এক্সারসাইজ দেয়া এবং তা মূল্যায়ন ও লিপিবদ্ধ করা, বাড়ির কাজ, অ্যাসাইমেন্ট দেয়া ও নেয়া– এগুলো নিঃসন্দেহে উন্নত প্রক্রিয়া, কিন্তু এটি বাংলাদেশে প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশগুলোতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রচলিত সেখানে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত প্রায় ১:১০। সরকারি প্রতিবেদন বলছে, আমাদের দেশে সে অনুপাত ১:৫৪। বাস্তবে এখানে প্রাথমিক বা মাধ্যমিকের একজন শিক্ষককে গড়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জনের ক্লাস পরিচালনা করতে হয়।

কর্তৃপক্ষ বলছেন, তারা ইতিমধ্যে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ বছর থেকে শ্রেণিকক্ষে ৫৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী রাখা যাবে না– এই নির্দেশ তারা জারি করেছেন। ধীরে ধীরে তা আরও কমিয়ে আনা হবে। মনে হয়, যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন তারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন। দেশের ২০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোগুলোর মধ্যে মাত্র ৬৮৪টি সরকারি, বাকি সবগুলো বেসরকারি। গত বছরের জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়গুলোর হাজার হাজার শিক্ষক ঢাকার রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন, বিক্ষোভ করেছেন, অনশন করেছেন। তাদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত জোর করে, কিছু আশ্বাস দিয়ে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই শিক্ষকরা তাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি তুলেছিলেন। তারা তাদের করুণ অবস্থার কথা বলেছেন, বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থার কথা বলেছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের দুর্নীতি, শিক্ষকদের স্বল্প বেতন, কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ দেয়ার পর সৃষ্ট জটিলতাসহ বিভিন্ন সংকটে ভারাক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পরই শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের কথা ভাবা যায়। এটা না করে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা মানে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া– তাতে বাস্তবে ভাঙাচোরা যে শিক্ষাব্যবস্থাটা কোনরকমে টিকে ছিল, সেটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫। অবকাঠামো উন্নত করলে ও শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনলেই কি ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুফল মিলবে? যে ধরনের ধারাবাহিক মূল্যায়ন এই শিক্ষাক্রমে প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটা কি উন্নত পদ্ধতি? যে সকল স্কুলে ভাল অবকাঠামো আছে সে সকল স্কুলে এই এক বছরের অভিজ্ঞতা কী বলছে? এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হবে ও চাপ কমবে বলে শিক্ষাক্রম প্রণেতারা যে দাবি করেছেন সেটা কি বাস্তবে সম্ভব হয়েছে?

– এই শিক্ষাক্রমে প্রণীত ধারাবাহিক মূল্যায়নে 'পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর' ও 'বিহেভেরিয়াল ইন্ডিকেটর' নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর ক্লাস পর্যায়ে মূল্যায়ন ও পরবর্তীতে সমষ্টিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে সামগ্রিক মূল্যায়ন তৈরি করার জন্য যে জটিল ম্যাট্রিক্স সৃষ্টি করা হয়েছে– তা শিক্ষকদের কাছে দুর্বোধ্য। একটা অ্যাপে শিক্ষার্থীদের সমগ্র ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকার কথা। সেই অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়েছে শিক্ষাবর্ষ শুরুর ৮ মাস পর এবং কিছুদিন পরই সেটি প্রায় বিকল হয়ে পড়ে। সে কারণে এক বছর পর বেশিরভাগ স্কুল তাদের শিক্ষার্থীদেরকে হাতে লেখা রিপোর্ট কার্ড দিয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষকের এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে এই মূল্যায়ন হয়েছে ভাসাভাসা এবং প্রায় নব্বই ভাগ শিক্ষার্থীকেই ফলাফলে সর্বোচ্চ স্তরে রাখা হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায়। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও পর্যাপ্ত ছিল না। মাত্র দুই থেকে পাঁচদিন প্রশিক্ষণ দিয়ে এই প্রায় সম্পূর্ণ নতুন এই শিক্ষাক্রম চালু করা হচ্ছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বাসায় যে সকল অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীদের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, যেটা গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারেই অসম্ভব। অ্যাসাইমেন্ট ও বাড়ির কাজ হিসেবে যা করতে দেয়া হচ্ছে, সেগুলোও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনর্থক। যেমন– পরমাণুর মডেল পড়ানোর সময় দেখা গেল সবাইকে শোলা দিয়ে সেই মডেল বানিয়ে আনতে বলা হচ্ছে। এটা সময় ও অর্থের অপচয়। শিক্ষক ক্লাসরুমে ভাল একটি থ্রিডি মডেল অথবা মাল্টিমিডিয়ায় দেখালে, শিক্ষার্থীরা এর চেয়ে ভাল বুঝতে ও শিখতে পারতো।

বলা হচ্ছে, ধারাবাহিক মূল্যায়নে 'পিআই' ও 'বিআই' এর মূল্যায়ন হিসেবে ত্রিভুজ, বৃত্ত বা চতুর্ভুজ দেয়া হবে। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়নে কিন্তু এই ত্রিভুজ, বৃত্ত বা চতুর্ভুজ থাকবে না। চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকাশিত হবে সাত ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শব্দে। সেগুলো হলো– অনন্য, অর্জনমুখী, অগ্রগামী, সক্রিয়, অনুসন্ধানী, বিকাশমান এবং প্রারম্ভিক। এগুলোকে বলা হচ্ছে পারদর্শিতার স্তর। বলা বাহুল্য এই স্তরে সবার উপরে আছে 'অনন্য' আর সবার নিচে আছে 'প্রারম্ভিক'।

অন্য সকল আয়োজন আছে ধরে নিলেও এই মূল্যায়ন বিভিন্ন দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। পারদর্শিতা অর্থাৎ 'পিআই' এর ক্ষেত্রে তাও একটা অবজেকটিভ বা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার আছে। সেখানে কিছু দক্ষতার মূল্যায়ন শিক্ষককে করতে হয়। কিন্তু আচরণগত অর্থাৎ বিআই এর ক্ষেত্রে সকল সূচকের মূল্যায়ন সাবজেকটিভ বা ব্যক্তিগত। অর্থাৎ শিক্ষক নিজে ঠিক করবেন একজন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে নিষ্ঠা, সততা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা (যেগুলো বিআই এর সূচক) ইত্যাদি কেমন এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। আর এই প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতা কমবে না। কারণ, খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে 'অনন্য' আর 'প্রারম্ভিক' এর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'এ প্লাস' না লিখে 'অনন্য' লিখলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মন থেকে প্রতিযোগিতা চলে যাবে, এটা সঠিক চিন্তা নয়। নম্বর পদ্ধতি বাদ দিয়ে গ্রেডিং চালু করার সময় যে ধরণের যুক্তি করা হয়েছিল, এখন 'এ প্লাস', 'এ', 'বি' ইত্যাদি গ্রেডিং তুলে 'অনন্য', 'প্রারম্ভিক' ইত্যাদি করার সময় একই ধরণের যুক্তি করা হচ্ছে। আসলে শিক্ষাক্রম প্রণেতারা সমস্যার কারণ ধরতে পারছেন না, বা জেনেও সমস্যার মূলে যেতে চাইছেন না।

৬। এই শিক্ষাক্রম কি বিজ্ঞানী তৈরি করবে? নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারকেও যদি একটা মানদণ্ড ধরি (যেটা শিক্ষাক্রম প্রণেতারা বারবার উল্লেখ করছেন), সেটা কি এই শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে?

– প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়কে ভালভাবে জানতে হয়। শিক্ষাক্রমকে জ্ঞানমুখী হতে হয়। কিন্তু এই শিক্ষাক্রম জ্ঞানমুখী নয়, দক্ষতামুখী। বারবারই এই শিক্ষাক্রমে এই দক্ষতা অর্জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস সমাপনীর পর সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটা নিয়ে যে কোন ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ে যুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এই ধরণের দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দিয়ে বিজ্ঞানী সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকেন, তাতে শিক্ষা

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সাম্যবাদ
১২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০২৪

প্রতিষ্ঠানে আয়োজন না থাকলে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতো দেশে প্রতিষ্ঠানমুখী শিখনব্যবস্থা দরকার, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন শক্তিশালী করা দরকার। অথচ এই শিক্ষাক্রমে করা হয়েছে উল্টোটা। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব কমিয়ে দিয়ে আশেপাশের পরিবেশ থেকে শেখার নামে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের বাইরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অ্যাসাইনমেন্ট ও হোমওয়ার্ককে ধারাবাহিক মূল্যায়নের একটা বড় অংশ করে দিয়ে পারিবারিক দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে, যেখানে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-গরীব পরিবারের সন্তানরা কিছু শিখতে পারবে না।

৭। ৯ম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন উঠিয়ে দেয়াটাকে কিভাবে দেখবো?

– দীর্ঘ দিন ধরেই এ অঞ্চলের শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত জনগণ Comprehensive education চালুর দাবি করে আসছেন। বর্তমান কারিকুলামে নবম-দশম শ্রেণির বিভাগ বিভাজন তুলে দেয়া হয়েছে। এতে অনেকেই মনে করছেন এবার Comprehensive education চালু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। সামগ্রিক শিক্ষা চালুর অন্যতম শর্ত হলো আগে একই ধারার শিক্ষা চালু করা। বর্তমান কারিকুলাম শিক্ষায় একই ধারা চালু করেনি। ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা, কারিগরি ও সাধারণ ধারা সবই আছে। উপরন্তু শিক্ষার সাধারণ ধারার মধ্যে বিভাগ বিভাজন তুলে দিয়ে সমন্বিত বিজ্ঞান শিক্ষাকে উন্নত করার বদলে এর মানের অবনমন ঘটানো হয়েছে, অনেক বেশি কারিগরিনির্ভর করা হয়েছে। পূর্বে বিজ্ঞান বিভাগ আর মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে যে ফারাকটা ছিল, সেটাকে তারা কিভাবে ভারসাম্যে নিয়ে আসলেন– তা পরিষ্কার নয়। এতে মানবিকের শিক্ষার্থীরা হয়তো পূর্বের চেয়েও একটু ভাল শিখতে পারবে, কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞান পড়ুয়াদের জন্য সংকট সৃষ্টি করবে। যদিও শিক্ষাক্রম প্রণেতারা এটা স্বীকার করছেন না। তারা বলছেন, শ্রেণিকক্ষে বরাদ্দ সময় ও বিষয়বস্তু– কোন দিক থেকেই বিজ্ঞানশিক্ষা আগের চেয়ে কমানো হয়নি। কিন্তু বাস্তবতা তা বলে না। বিজ্ঞানের ক্লাস সংখ্যা কমানো হয়েছে। আবার বিষয়বস্তু কমেছে শুধু নয়, 'অনুসন্ধান' ও 'অনুশীলন'– দুটি আলাদা বই করে বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনিতেই দেশে বিজ্ঞান শিক্ষকের সংকট, দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট আরও বেশি। এর মধ্যে যদি বইয়ের ব্যাখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়, সেটা বিজ্ঞান শিক্ষাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে।

সমন্বিত শিক্ষায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান) মৌলিক ধারণাগুলি দেয়ার কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় ধারণাকে অপ্রধান করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক শুধু দেখলে হবে না, এখানে একজন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত 'ইন্টার ডিসিপ্লিনারি' শিক্ষা দেয়া হবে, যাতে সে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। প্রাক-প্রাথমিকে কোন পাঠ্যপুস্তকই নেই। নবম ও দশম শ্রেণি মিলে ধারাবাহিকতায় যে বিজ্ঞান পড়ানো হতো এবং শেষে দুটো ক্লাসে পড়ানো কোর্সের সম্পূর্ণটা নিয়ে পরীক্ষার আয়োজন করা হতো– তার একটা উদ্দেশ্য ছিলো। এই ধারাবাহিকতাকে ভেঙে নিচ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করতে হলে নিচের স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সে সক্ষমতা থাকা দরকার। সেটা একেবারে নেই।

আবার এই 'ইন্টার ডিসিপ্লিনারি' শিক্ষা চালু করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ধারণা ও বিষয় (কন্টেন্ট) কমানো হয়েছে। কোন একটি বিষয় নিয়ে মৌলিক ধারণা না থাকলে একজন শিক্ষার্থী অন্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক কী, তা বুঝতেই পারবে না। রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান– তিনটি বিষয়কে একসাথে করতে গিয়ে সব বিষয়েরই অধ্যায় কমানো হয়েছে। আর তার জায়গায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা', 'জীবন-জীবিকা' ইত্যাদি অমৌলিক বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার বুনিয়াদি স্তরে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি শিক্ষা কার্যত বিশেষ বিশেষ 'ডিসিপ্লিন' সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠার পথকেই মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করবে। এটি বহু আকঙ্ক্ষিত সমন্বিত শিক্ষা নয়।

৮। এই শিক্ষাক্রম মুখস্ত শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর উপর চাপ কি কমাবে?

মুখস্ত শিক্ষা, প্রতিযোগিতা– এসবের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে বারে বারেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি, এমসিকিউ, কমিউনিকেটিভ ইংরেজি– ইত্যাদি প্রতিটি পরিবর্তনের আগে এই মুখস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিবারই দেখা গেলো 'মুখস্ত শিক্ষা', 'প্রতিযোগিতা'– ইত্যাদি থাকলো, কিন্তু কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হলো। কেন শিক্ষার্থীরা মুখস্ত করে, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ কী– সেটা চিহ্নিত ও নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে এই মুখস্ত শিক্ষা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা নির্মূল করা যাবে না। বর্তমান কারিকুলাম প্রণেতাদের মত হলো– পরীক্ষা পদ্ধতিই মুখস্ত শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার একমাত্র কারণ। তাই তারা পরীক্ষাই তুলে দিতে চাইছেন। প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়েছেন। পরীক্ষাবিহীন, দুর্বল অবকাঠামোয় শিক্ষা নেয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কিছু শিখতেই পারবে না। এক অর্থে এটা প্রতিযোগিতা কমাবে– নিম্নবিত্তরা উচ্চবিত্তের ভাল স্কুলের সন্তানদের সাথে প্রতিযোগিতা করার আর কোন ক্ষমতাই রাখবে না। আর তথাকথিত ভাল স্কুলগুলোতে পরীক্ষা ঠিকই চালু থাকবে, বাণিজ্যিক স্কুলের সংখ্যা বাড়বে। পরীক্ষা বাদ দিয়ে ড্রপ আউট কমাতে গিয়ে স্কুলগুলোই ড্রপ আউট হয়ে যাবে।

এ দেশে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি, চাকুরিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিশ্চয়তা। এসব ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে হলে একজনকে তীব্র অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই প্রতিযোগিতার রিলে রেসে সৃজনশীল ভাবনা, মননশীলতার কোন স্থান নেই। মানুষের ভাবনা চিন্তা ও গণতান্ত্রিক চর্চার অবাধ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হলে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীল ভাবনা ইত্যাদির প্রবাহ রুদ্ধ হতে বাধ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রে এ রকম বন্ধ্যাত্ব বহাল রেখে শুধু পরীক্ষা তুলে দিলেই মুখস্ত নির্ভরতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কমবে না।

৯। এই শিক্ষাক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

- এই শিক্ষাক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই পাল্টে দিচ্ছে। নবজাগরণ সামন্তীয় সমাজ ভেঙ্গে সবার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার ধারণা নিয়ে আসে। মানুষের মধ্যে স্বাধীন চেতনা ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তি সৃষ্টির জন্য জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠে নবজাগরণের শিক্ষাব্যবস্থা। এ জন্য শিক্ষাক্রম সাজানো হতো 'জ্ঞান-দক্ষতা-আচরণ' এই ক্রম অনুসারে। আজ পুঁজিবাদের আর বিকাশ ঘটছে না। গোটা অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত। উৎপাদিকাশক্তি অলস পড়ে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অব্যাহত বিকাশ এখন তার আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠলে যে কোন মানুষ এই ব্যবস্থাকে ভাঙতে চাইবে। তাই এখন তারা স্লোগান তুলছে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার। আর এ জন্য তারা কারিকুলামকে সাজাচ্ছে 'দক্ষতা-জ্ঞান-আচরণ' এই ক্রমানুসারে। অর্থাৎ জ্ঞান নয়, দক্ষতাকেই প্রধান করা হচ্ছে। আর এ জন্য শিক্ষাক্রমে আসছে থিমভিত্তিক শিক্ষার কথা। যার ফলে বিষয়বস্তুগুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন ছোট ছোট বাণিজ্যিক কোর্সের মতো।

নতুন শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে 'রূপান্তরমূলক দক্ষতা' ও 'অভিযোজন' সক্ষমতা অর্জনের কথা। সংকটগ্রস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজি আজ এক সেক্টরে তো কাল আরেক সেক্টরে বিনিয়োগ হচ্ছে। তাই স্থায়ী কোন কর্মসংস্থান গড়ে উঠছে না। এরূপ অস্থিতিশীল ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কর্মীবাহিনী যেন একটি খাত থেকে অন্যখাতে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে এরই পোশাকি নাম হচ্ছে অভিযোজন সক্ষমতা ও রূপান্তরমূলক দক্ষতা। অথচ এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে গিয়ে মানিয়ে নিতে পারলেই একজনের নিশ্চিত চাকুরি হবে– বিষয়টি মোটেই এমন নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ, কাজের নিরাপত্তা– এমনকি গোটা জীবনটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই সংকটের কারণ কী, কেন শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না, কেন আমাদের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত গার্মেন্টস খাতে যত মুনাফা বাড়ছে তত কর্মসংস্থান বাড়ছে না– এর কারণ অনুসন্ধান না করে গোটা জাতিকে বিভিন্ন কাজে 'সুপারস্কিল্ড' করেও কোন লাভ হবে না। রাষ্ট্রের শোষণের ফলে সৃষ্ট সংকটকে ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানোর জন্য তাকে বলা হচ্ছে, তোমার দক্ষতা নেই, তাই তুমি চাকরি পাচ্ছ না। অথচ পলিটেকনিক থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীরা বেকার পড়ে আছে। আর শিক্ষাক্রমে বার বার কর্মমুখী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন শিক্ষাক্রম এসেছে মূলতঃ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) এর লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক এর সুপারিশ এবং Sustainable Development Goal (SDG) সূচক অর্জনের জন্য। OECD সংস্থাটি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষায় বিশ্বব্যাপী বাজার অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে। ২০০৯ সালে এ সংস্থা 'অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা নীতি: দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধান' নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে সংস্থাটি তার সদস্য দেশগুলিকে পরামর্শ দেয় যে, চলমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচার উপায় হলো 'শিক্ষায় বিনিয়োগ'। আর এর পরিপূরক করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজাতে 'দক্ষতাভিত্তিক' ও 'যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা' ধারণাকে আমদানি করা হয়েছে। অর্থাৎ এ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলি নতুন চালু করা হলো, তা মূলত বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত।

১০। নতুন শিক্ষাক্রম কি বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ বৃদ্ধি করবে, শিক্ষার ব্যয় বাড়াবে?

- অ্যাসাইনমেন্ট ও হোমওয়ার্ক তৈরিতে যে খরচ হবে সেটা বহন করা দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পাঠ্যপুস্তক নেই, পর্যাপ্ত আয়োজন নেই। প্রাথমিকের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা নেই। এই পরিস্থিতিতে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলো চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে, যত্নের সাথে শেখানোর দায়িত্ব নিয়ে গজিয়ে উঠবে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সন্তানরা যাতে কিছুটা হলেও শেখে, সেই আশায় অভিভাবকরা এসকল প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের ভর্তি করবেন। অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও মর্যাদাপূর্ণ বেতনভাতা ঘাটতির সাথে নতুন শিক্ষাক্রম শিক্ষকদের শিক্ষাদানকে কঠিন করে তুলবে। এসবকিছুর সমষ্টিগত প্রভাবে কোচিং ও গাইড নির্ভরতা বাড়বে। অতীতেও একই চিত্র দেখা গেছে।

বলা যায় সমস্ত দিক থেকে এই রকম একটি গণবিরোধী শিক্ষাক্রম আওয়ামী সরকার প্রণয়ন করেছে নানান গাল ভরা প্রগতিশীল শব্দ আউড়ে। এতে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ এ রকম মোহ বা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে বলেই এতদিন গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকতে পারছে। এ গণবিরোধী শিক্ষাক্রম বাতিলের আন্দোলন শুধু শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন নয়, বরং ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শিক হাতিয়ারকে রুখে দেয়ারও আন্দোলন। এই আন্দোলনে সকলকে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা আহবান জানাই।

শ্রমিক-কৃষক বিক্ষোভ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জার্মানির গোটা রেল ব্যবস্থা। লন্ডনে একের পর ধর্মঘটের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন জুনিয়র ডাক্তার ও রেল কর্মীরা। গত ১৮ জানুয়ারি উত্তর আয়ারল্যান্ডে জড়ো হন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ শ্রমিক ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। সুইডেনে টেসলার শ্রমিকরা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এ আন্দোলনের সমর্থনে ইউরোপের দেশে দেশে বিক্ষোভ হয়েছে। ফিনল্যান্ডে চলছে শ্রমিক বিক্ষোভ। আর্জেন্টিনার দক্ষিণপন্থী জাভিয়ার মিলেই সরকার সম্মুখীন হচ্ছেন তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের। গত ২৪ জানুয়ারি ফুটবল ঈশ্বর ম্যারাডোনার দেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল লাখ লাখ শ্রমিকের বিক্ষোভের মুখে।

এটা ঠিক যে, স্বতস্ফূর্ত এ বিক্ষোভে আপনা আপনি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে লড়াইয়ের যে চেতনা, পারস্পরিক যে সংযোগ গড়ে উঠেছে তা অমূল্য। একে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তর করা বিপ্লবী বামপন্থার ঐতিহাসিক কর্তব্য। এ লক্ষ্যেই সত্যিকারের কমিউনিস্টরা এগিয়ে আসবেন এটাই সময়ের আহ্বান।

ফিলিস্তিন মুক্ত কর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সহায়তা দিয়েছে। যা দিয়ে তারা গোটা ফিলিস্তিনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। গত মাসে মার্কিন বিমান বাহিনীকে জোর করে গাজায় আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়। এরই প্রতিবাদে অ্যারন বুশনেল আত্মাহুতি দেন। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো বলতে চাইছে, বুশনেল মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গণহত্যাকে 'যৌক্তিক' করতে এই প্রচার ছাড়া তাদের আর কি-ই বা করার আছে?

এটা ঠিক, বিক্ষিপ্তভাবে আত্মহুতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করা যাবে না, কিন্তু এও ঠিক যে, যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে যে তীব্র ঘৃণা নিয়ে বুশনেল আত্মাহুতি দিলেন তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর দেশে দেশে গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হচ্ছে। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করছেন।

জাত-ধর্ম-বর্ণের প্রয়োজনে নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের পথেই মানবিক বিশ্ব গড়ে উঠতে পারে।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০২৪

বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের স্বরূপ

বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সমাজ জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয় আগ্রাসনের কালো থাবা পড়েনি। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ আর ভারতের শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা একইরকম ছিল না। ভারতের জনগণ সহযোগিতা করেছে মানবিক কারণে, আর ভারতের পুঁজিপতিদের মুখপাত্র তার শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হয়েছে এদেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদী বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে বাংলাদেশের জনগণ পিষ্ট। বর্তমানে এই আগ্রাসন অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ভারতের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল, ভারতও তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবরকম সুরক্ষা দিচ্ছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে নিষ্পেষিত এদেশের মানুষ মুক্তি চায়। তাই রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের চরিত্র কী, কোন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই আগ্রাসন– এ প্রশ্নে মীমাংসা অত্যন্ত জরুরি।

ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র

আওয়ামী সরকার প্রতিনিয়ত প্রচার করছে ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আবার বহু প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক মানুষ মনে করেন ভারত একটি আধা উপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। ভারতে বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি নেই, যা আছে সব সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার দালাল বুর্জোয়া। বাস্তবে ভারত বহু পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ভারত একই সময়ে চীনের নেতৃত্বাধীন 'সাংহাই সামরিক জোট' এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 'কোয়াড'-এ যুক্ত– যা প্রমাণ করে ভারত এখন আর সাম্রাজ্যবাদের 'জুনিয়র পার্টনার' নয় বরং তার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী অভিলিপ্সা আছে এবং সে নিজের মতো করে এগোচ্ছে। ভারতের এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার সকল সাধারণ মানুষই ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবেন।

সরকারি হিসাবে ভারতের বর্তমান অর্থনীতির আকার ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারত সরকার ঘোষণা দিয়েছে, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে তারা তাদের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে রূপান্তর করতে চায়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আইএমএফ তাদের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, জিডিপির বিচারে বিশ্বে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থান ৫ম। এ দেখে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ভারতের সাধারণ জনগণ খুব ভাল আছেন। বরং লক্ষ কোটি মানুষকে পথে বসিয়েই এই 'ম্যামথাকৃতির' অর্থনীতির জন্ম হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্সফামের তথ্য বলছে, ভারতের ধনী মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে দেশের মোট ৬০ শতাংশ সম্পদ। আর নিচের তলার দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। মানুষকে নিঃস্ব করেই গড়ে উঠেছে সম্পদের এই বিপুল কেন্দ্রীকরণ। অক্সফামই জানাচ্ছে, ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতে শতকোটি টাকার মালিকের সংখ্যা ১০২ জন থেকে বেড়ে ১৬৬ জন হয়েছে। অর্থাৎ ইতোমধ্যেই ভারতে একটি শক্তিশালী একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, হাজার হাজার নিরন্ন কৃষক বা কৃষিক্ষেত্রে অনেকটা সামন্তীয় ধাঁচা বহাল থাকার পরও কী করে ভারত একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিতে পারে? তারা ভুলে যান যে, অসম বিকাশই পুঁজিবাদের ধর্ম। পরিকল্পিত অর্থনীতি ছাড়া আজকের বিশ্বে কোন দেশই কৃষি ও শিল্পে সুষম বিকাশ ঘটাতে পারবে না। এ আলাপও আছে যে, ভারতে তো প্রচুর বিদেশী পুঁজি খাটছে। সেই ভারত কি করে বাইরে পুঁজি লগ্নি করবে। বর্তমান সময়ে কোন পুঁজিপতিরাই জাতীয় উন্নতির ধার ধারে না। তার নিজের দেশকে ক্ষেত্রসাপেক্ষে যেমন অন্যদেশের পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, আবার একইভাবে সে যদি দেখে নিজের দেশের চেয়ে বাইরে পুঁজি বিনিয়োগ করলে লাভ বেশি– তাহলে সে তাই করে। চীন ও আমেরিকা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হলেও উভয় রাষ্ট্রেই উভয়ের পুঁজি খাটছে।

সত্য হলো, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ইতোমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ৫০০টি 'সুপার মনোপলি' গোষ্ঠির মধ্যে ভারতের সংখ্যা ৯টি। 'ফোর্বস ২০০০'

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

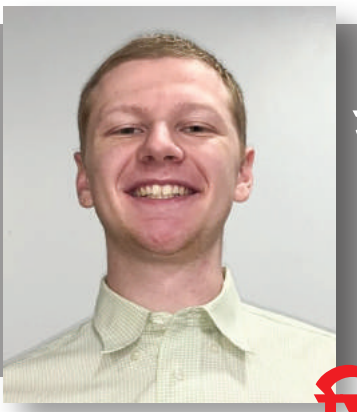

বুশনেলের শেষ উচ্চারণ

ফিলিস্তিন মুক্ত কর

নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় সম্পদ মানুষের আর কিছু নেই। এ জীবন মানুষ একবারই পায়। অ্যারন বুশনেলও নিশ্চয় এ কথা জানতেন ! কিন্তু সেই জীবনকে তিনি হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছেন। গাজায় বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন এ মার্কিন সৈনিক। শরীর পুড়ছে, অসহ্য যন্ত্রণা – কিন্তু বুশনেল চিৎকার করে বলছেন, 'ফ্রি-প্যালেস্টাইন'।

আত্মাহুতি দেয়ার আগে বুশনেল দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমার নাম অ্যারন বুশনেল। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য এবং আমি গণহত্যার সাথে আর জড়িত থাকবো না। প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর যে গণহত্যা চলছে, তার বিরুদ্ধে আজ আমি এক চরম প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছি। যদিও প্যালেস্টাইনের মানুষ তাদের উপনিবেশকারীদের হাতে প্রতিদিন যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে এটি চরম কিছু নয়, আমাদের শাসক শ্রেণি যাকে স্বাভাবিক হিসেবেই ভেবে নিয়েছে। ফ্রি প্যালেস্টাইন!"

ফিলিস্তিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট জায়নবাদী ইজরাইলের নৃশংসতা থামছেই না। গাজার বাতাসে বারুদের গন্ধ, রাস্তায় লাশের স্তূপ। বোমার আঘাতে প্রতিদিনই ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু। ইতোমধ্যেই মারা গেছে ১০ হাজার শিশু।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতির কিছুই তোয়াক্কা করছে না এই রক্তখেকো হায়েনারা। হাসপাতালে বোমা মারছে, চিকিৎসা সেবা পর্যন্ত নিতে পারছে না গাজার মানুষ। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি আল রশিদ স্ট্রীটে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু গাজাবাসী। সেখানে মার্কিন বিমান হামলায় মারা গেছেন ৭০ জন, আহত হয়েছেন ২৫০ জন। খাবার, পানীয়জল, চিকিৎসাসেবা – কিছুই পাচ্ছেন না ফিলিস্তিনের মানুষ। এক অমানবিক পরিস্থিতি সেখানে তৈরি হয়েছে।

এই ভয়াবহ নৃশংসতার পেছনে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বাইডেন সরকার ইজরাইলকে ইতোমধ্যেই ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

আঁধারে আশার আলো

দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষক বিক্ষোভ

গভীর অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন দেশে দেশে শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারি, মজুরি ও ভর্তুকি কমানোর পথে হাটছে, ঠিক তখনই গোটা পৃথিবীতে রাস্তায় নেমে আসছেন শ্রমিক-কৃষকরা। সরকারের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশে দেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে।

ভারতের কৃষকরা আবারও আন্দোলনে নেমেছেন। ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও ঋণ মওকুফের দাবিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে কৃষকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'অন্নদাতা' কৃষকদের রুখতে দিল্লি সীমান্তে ছয় স্তরের নিরাপত্তা ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিলো। শুধু দিল্লি নয়,গত এক বছরে পৃথিবীর ৬৫টিরও অধিক দেশে কৃষকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

ফ্রান্সে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকারের গণবিরোধী কৃষিনীতির প্রতিবাদে ট্রাক্টর নিয়ে রাজধানী প্যারিস অবরোধ করেছেন কৃষকরা। বিক্ষুব্ধ কৃষকরা প্রশাসনিক ভবনগুলিতে গোবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। গ্রেফতার করে, মামলা দিয়ে এ আন্দোলন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। কৃষকরা দাবি করছেন, কৃষি ফসলে ন্যায্য দাম নিশ্চিত, সারের দাম কমানো ও ডিজেলের উপর বাড়তি কর

প্রত্যাহারের। সরকার এ দাবি না মানলে ফ্রান্সে অলিম্পিক আসর চলাকালেও কৃষকরা অবরোধ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন। প্যারিস থেকে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বেলজিয়ামে। প্যারিস ও ব্রাসেলস এর সংযোগ সড়ক অবরোধ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। ইতালি, রোম, রোমানিয়া, পোল্যান্ডের কৃষকরা নেমে এসেছেন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে। পোল্যান্ডের বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ছিঁড়ে ফেলেছেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের পতাকা। জার্মানিতে ফেটে পড়ছে শ্রমিক, কৃষকদের বিক্ষোভ। জার্মানির বার্লিনে গত ১৫ জানুয়ারি ৫ হাজার ট্রাক্টর নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ১০ সহস্রাধিক কৃষক। নেপাল, মালেশিয়ায় কৃষকরা বিক্ষোভ করছেন চাল ও আখের ন্যায্যমূল্যের জন্য। কৃষক বিক্ষোভ চলছে আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেনের মতো দেশে।

গোটা ইউরোপ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে ধর্মঘটের বন্যা। কর্মঘন্টা কমানো, বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে 'জার্মান ট্রেন চালক ইউনিয়ন'-এর ডাকে জার্মানির ইতিহাসের দীর্ঘতম রেল ধর্মঘট করেছেন শ্রমিকরা। ২৪ থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ৬ দিনের এ বিক্ষোভে অচল হয়ে পড়ে

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org